দ্বিতীয় অভ্র

আবুল ফাতাহ

দ্বিতীয় স্বপ্ন

আবুল ফাতাহ

প্রকাশনী

মুখবন্ধ

অভ্র সিরিজের এটা অষ্টম বই।

আমার যতদূর জানাশোনা, বাংলায় মৌলিক খুব কম সিরিজই আছে যার আটটা বই বের হয়েছে। এদিক বিবেচনায় ব্যাপারটা আনন্দের হলেও এই বই নিয়ে আমি খানিক দুঃশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি। অভ্র সিরিজটা সাধারণত হালকা ধাঁচের হয়ে থাকে, কিছু রহস্য, কিছু হাস্যরস, কিছু প্রেম—এই তো।

কিন্তু এই বইটা এমন ডার্ক টার্ন নেবে, আমি লেখার শুরুতে বুঝতে পারিনি। লিখতে গিয়ে দেখলাম, গল্পটা যেদিকে যাচ্ছে, অভ্রর নিয়মিত পাঠকদের জন্য তা বেশ অস্বস্তিকর হবে। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না, ততক্ষণে গল্পের চরিত্রদের হাতে আমার লেখকসত্ত্বা আত্মসমর্পণ করেছে। তবুও কিছু কিছু বর্ণনা লিখতে গিয়ে লাগাম টেনে ধরতে হয়েছে। অভ্র সিরিজকে যারা সবসময় 'লাইটহার্টেড' হিসেবেই দেখতে চান, তারা সম্ভবত এই বইটি না পড়লেই ভালো করবেন।

আর যদি এই বইটা ভালো লাগে তাহলে হয়তো অভ্র মাঝে মাঝে সাদাকালোর সীমাটা পার হয়ে ওপারে উঁকি দেবে।

আপনাত মতামতের অপেক্ষায় থাকব আমি।

আবুল ফাতাহ

১৮.২.২৫

নেশা করার পর একটা অদ্ভুত জগতের দরজা খুলে যায়। আধো জাগরণ আর আধোঘুমের মাঝামাঝি এক জগত। তখন কোনটা বাস্তব আর কোনটা বিভ্রম—তার রেখাটা আবছা হয়ে আসে।

এই অভিজ্ঞতার কাছাকাছি আরেকটা জগত আছে—মানুষের যখন প্রচণ্ড ঘুম পায় কিন্তু কোনও কারণে ঘুমটা জাঁকিয়ে বসতে পারছে না, তখন সে এই জগতে প্রবেশ করে। আমি এই মুহূর্তে সেই জগতেই আছি এবং সেখান থেকেই এইসব ধুনফুন চিন্তাভাবনা করছি। ভালো লাগছে।

যদিও আমি এভাবে ঝুলে থাকতে চাইছি না, চাইছি গভীর ঘুমে ঢলে পড়তে কিন্তু একটা কাক তারস্বরে চেচাচ্ছে। অনেকদিন কাকের ডাক শুনি না। অবশ্য আমি তো রোজ রোজ রমনা পার্কের বেঞ্চিতে শুয়েও থাকি না। ইদানিং থাকছি, কারণ হাতে কোনও কাজ নেই। আফরীন সপরিবারে দেশের বাইরে বেড়াতে গেছে। চন্দ্রিমা তার চিড়িয়াখানা নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে খুব যেতে বলে, কিন্তু আমি ডুব দিয়েছি।

ছায়া-ঢাকা একটা গাছের নিচে সিমেন্টের বেঞ্চে শুয়ে আছি আমি। চারপাশে ঘাসের সুবাস।

কাকটা আবার ডাকল। আমি পাত্তা দিলাম না। ঘুম গাঢ় করার চেষ্টা চালাচ্ছি, ঠিক তখনই এক অদ্ভুত নরম স্পর্শ অনুভব করলাম মাথার ওপর।

চমকানোর মতো অবস্থা না, কিন্তু অবাক তো লাগছেই। ছোটোবেলায় মা এভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, সেও তো অনেকদিন হলো। অথচ এখন, এখানে, রমনা পার্কের এই পুরোনো বেঞ্চে, কে যেন আলতো হাতে আমার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। আমার এখন ধড়মড় করে উঠে দেখা উচিত, ঘটনা কী? কিন্তু বিলি কাটার আরামে ঘুম জেঁকে ধরতে চাইছে।

'ভাইজান, ঘুমাইয়া গ্যাছলেন?'

নাহ, ডাক এসেছে। আর ঘুমানো চলে না। আমি মুনিঋষিদের মতো আস্তে আস্তে চোখ খুললাম।

একটা ছোটো ছেলে। বয়স দশ-এগারো হবে। গায়ে ময়লা হলুদ গেঞ্জি, তার নিচে ছেঁড়া একটা হাফপ্যান্ট। কাঁধে বাদামের ঝুড়ি, চোখদুটো কৌতূহলে টলটল করছে। কণ্ঠে বরিশালের আঞ্চলিক টান স্পষ্ট।

আমি হাই তুলে উঠে বসলাম। শরীরটা একটু কুঁকড়ে ছিল, সেটাকে প্রসারিত করলাম। তারপর একটু বাঁকা হেসে বললাম, 'তুই কি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা নাকিরে?' বলেই চমকে গেলাম। ছেলেটার কী সুন্দর একটা নাম দিয়ে দিলাম!

ছেলেটা হেসে ফেলল। দাঁতগুলো বেশ উজ্জ্বল, চোখেও একটা চাঞ্চল্য।

'ভাইজান, ওই ব্যাডা আপনারে বোলায়।'

আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম।

'ওই যে ওই বেঞ্চে।' ছেলেটা হাত প্রসারিত করল। আমি চোখ ফেরালাম একটু দূরের বেঞ্চের দিকে।

সেখানে একজন বসে আছে।

অদ্ভুতভাবে।

হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে বেঞ্চের দুপাশে, যেন এই পুরো বেঞ্চটাই তার রাজত্ব। শরীরটা এলিয়ে রেখেছে বেশ একটা কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে। পরনে ঢিলেঢালা সাদা পাঞ্জাবি, চোখে গাঢ় রোদচশমা। ঠোঁটের কোণে হালকা একটা হাসি লেগে আছে।

আমি এক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা নিজে এসে ডাকতে পারত। কিন্তু না, সে এক শিশুকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল। কেন?

সে কি আমাকে বোঝাতে চাইছে যে আমি তার চেয়ে ছোট? নাকি অলসতা?

আমি সহজে বিরক্ত হই না। এখন হলাম। নবাব সলিমুল্লাহ খানের বংশধরটা কী চায় আমার কাছে?

আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বাদামের ঠোঙা কত করেরে?'

ছেলেটা একটু অবাক হলো, তারপর বলল, 'দশ টেকা ভাইজান।'

আমি পকেট থেকে বিশ টাকা বের করে ওর হাতে দিলাম।

‘তুই নিজে এক প্যাকেট খা, আরেকটা আমাকে দে। আমি ওই লোকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। মনে হয় রাজার ছেলে, এক ঠোঙা বাদাম ভেট নিয়ে যাই, কী বলিস?’

ছেলেটা কী বুঝল জানি না, খুশি হয়ে হাসল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, ধীরে ধীরে নবাবপুত্রের বেঞ্চের দিকে এগোলাম এক ঠোঙা বাদাম হাতে।

লোকটা তখনও সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে। যেন সে এই পার্কের মালিক, আর আমি তার রাজ্যে প্রবেশ করছি।

রমনা পার্কের বাতাস ভারী হয়ে আছে শুকনো পাতা আর ঘাসের সোঁদা গন্ধে। চারপাশে মানুষের কোলাহল থাকলেও এখানে, এই বেঞ্চ দুটো ঘিরে এক ধরনের শূন্যতা কাজ করছে। আমি ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এক হাতে বাদামের ঠোঙা। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে কিছু একটা আছে, আমার অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমি নাটকের মঞ্চে হাঁটছি, যেখানে আলো আর একমাত্র দর্শকের দৃষ্টি শুধু আমাকেই অনুসরণ করে চলেছে।

লোকটা এখনও সেই আগের ভঙ্গিতেই বসে আছে। হাত দুটো ছড়িয়ে, পায়ের একটা হাঁটু আরেকটার ওপর রাখা। কিন্তু তার মুখটা ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, তার গোটা অস্তিত্বের কোথাও একটা চাপা অস্থিরতা লুকিয়ে আছে। বয়স চল্লিশের ঘরে, মাঝারি স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ কালোর দিকে।

আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, দেখি সে নিজে কথা বলে কিনা। কিন্তু লোকটা চুপ। যেন আমার দিক থেকেই নীরবতা ভঙ্গের অপেক্ষা করছে।

আমি একটা বাদাম মুখে পুরলাম, এরপর একটা নকল হাই তুলে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে বললাম, ‘তুমি আমাকে ডেকেছো?’ ইচ্ছে করেই ‘তুমি’ বললাম, যেন লোকটা একটা ধাক্কামতো খায়।

সে আস্তে করে মুখ তুলে তাকাল। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো, তার চোখের পেছনে আরেকটা মানুষের অস্তিত্ব আছে।

সে সামান্য হাসল। ‘আপনার নাম কী?’

আমি এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। মনে হয় না, আমি ‘তুমি’ বলাতে তার কোনও বিকার ঘটেছে।

‘গোলাম দস্তগীর হায়দার চৌধুরী।’ বললাম আমি।

সে আবারও হাসল, 'এটা ভুয়া নাম, তাই না?'

'অবশ্যই ভুয়া নাম। অপরিচিত কেউ নাম জিজ্ঞেস করলেই নাচতে নাচতে আসল নাম বলার কোনও কারণ নাই।'

'আচ্ছা, তাহলে পরিচয় দেই। আমি আহসান আলী খান। আপনাকে ডাকার কারণ আছে।'

আমি তার পাশে বেঞ্চে বসে পড়লাম, দু'পা সামনে প্রসারিত করে দিয়ে। কারণ জানতে ইচ্ছে করছে।

আহসান আলী খান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। যেন কথা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এরপর খুব ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার চেহারা... একদম আমার ছোটো ভাইয়ের মতো।'

আমি আরেকটা বাদাম ছিলতে ছিলতে উদাস গলায় বললাম, 'জেনে ধন্য হয়ে গেলাম।'

'ও দুমাস আগে মারা গেছে।'

এবার আমি একটু থমকে গেলাম। মৃত্যু জিনিসটাই এমন—মৃত এবং জীবিত, সবাইকে থমকে দেয়। কাউকে এক মুহূর্তের জন্য, কাউকে বা চিরতরের জন্য।

'সরি।'

'সরির কিছু নেই, আমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য তোমার কোনও দায় নেই' কথাটা বলার সময় তার কণ্ঠস্বরে একটা পরিবর্তন এল। কেউ যদি মনোযোগ না দেয়, হয়তো ধরতেই পারবে না। কিন্তু আমি ধরতে পারলাম। তার গলা সামান্য ভারী হয়ে গেছে। চোখের কোণে কিছু একটা চকচক করল তার।

'তুমি হয়তো ভাবছো, তোমাকে দেখে আমার ছোটো ভাইয়ের কথা মনে পড়েছে তাই ডেকেছি।' লোকটা ফের বলল, 'ব্যাপারটা আংশিক সত্য।'

আমি এবারও কিছু বললাম না। সন্ধ্যার ডাক এসেছে, নামবে এখনই।

'বাদাম খাবেন?' বলে আমি বাদামের ঠোঙা বাড়িয়ে দিয়েই লক্ষ্য করলাম, লোকটার মধ্যে আসলেই এক ধরনের কর্তৃত্ব আছে। প্রথমে আমি তাকে 'তুমি' সম্বোধন করলেও সে আমাকে 'আপনি' বলেছিল। কিন্তু কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আমার অজান্তেই পাশার দান উলটে গেছে। সে এখন আমাকে 'তুমি' বলছে, আর আমি তাকে 'আপনি'।

'আমার মায়ের খুব অসুখ,' বলে লোকটা দুটো বাদাম তুলে নিল আমার

ঠোঙা থেকে। 'ক্যান্সার; ডাক্তাররা সর্বোচ্চ একমাস সময় বেঁধে দিয়েছে। আমার ছোটো ভাই হাসান বিদেশে থাকত। দুমাস আগেই ওখানে একটা এক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমি মাকে জানাইনি যে তার ছোটো ছেলে আর নেই। কী দরকার, মৃত্যুপথযাত্রী একজনকে বাড়তি কষ্ট দেয়ার?'

'তা ঠিক, আমি আপনার জায়গায় হলেও হয়তো একই কাজ করতাম।'

'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মা ইদানিং হাসানকে খুব দেখতে চায়, কথা বলতে চায়। আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখি, কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। খুব জেদ করে। এজন্য আমি সাধারণত বাড়িতে থাকি না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। মা'র কষ্ট দেখতে ইচ্ছা করে না।'

আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাতাস হালকা হলেও আশপাশের গাছের পাতাগুলো একটু বেশি শব্দ করছে বলে মনে হলো। লোকটা আমার কাছে কী চায়?

'আজ তোমাকে দেখে আমি চমকে গেছি, একদম হাসানের মতো দেখতে তুমি।'

আমি বোধহয় একটু একটু আঁচ করতে পারছি, লোকটা কেন ডেকেছে আমাকে।

'তাই আমি চাই, তুমি আমার ভাই সেজে আমাদের বাসায় কয়েকদিন এসে থাকো।'

আমি এবার পুরোপুরি সোজা হয়ে বসলাম। যা ভেবেছিলাম, সেটাই ঘটেছে।

'দেখুন, আহসান সাহেব, আপনার পরিবারের জন্য আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আপনি যা চাইছেন, সেটা আসলে সম্ভব না। চেহারার যতই মিল থাকুক, মা তার ছেলেকে চিনবে না?'

'মা'র চোখের সমস্যা আগে থেকেই, ব্রেইন ক্যান্সারের কারণে আজকাল স্মৃতিশক্তিও খুব কমে গেছে। ডিমনেশিয়া। আমি নিশ্চিত, উনি ধরতে পারবেন না। শুধু কয়েকটা দিন, এরপর তো সে চলেই যাবে, যাওয়াটা শান্তির হোক...।'

আমি কিছু বলতে যাব, তার আগেই আহসান সাহেব তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'এর জন্য আমি তোমাকে দুই লাখ টাকা দেব।'

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম।

'আ...আমি আসলে দুঃখিত, টাকার কথাটা এভাবে বলাটা উচিৎ হয়নি।'

আমি চুপ করে বসে রইলাম। মাথার ভেতর একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছে। একজন মৃত মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করা সহজ ব্যাপার না। মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধা আমাকে তার ছেলে ভেবে ভালোবাসবে, আশীর্বাদ করবে। তারপর একদিন সে চলে যাবে... আমিও আবার অভ্র হয়ে এই নগরের পথে নামব।

আহসান আলী খান চুপচাপ আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে।

আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

'দুঃখিত, আহসান সাহেব। আমি পারব না।'

লোকটা কিছু বলল না। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'আমার মনে হচ্ছে, কাজটা উচিৎ হবে না। মানুষকে তার সারাজীবনে অনেক কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে হয়, এটাই তার নিয়তি। আপনার মায়ের কষ্ট হলেও, সত্যটা জেনে বিদায় নেয়াই হয়তো তার নিয়তি। নিয়তি বদলানোর ক্ষমতা আমার নেই।'

আমি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না। বাদামের ঠোঙাটা বেঞ্চে রেখে হাঁটা দিলাম পার্কের গেটের দিকে।

আমি জানি, আমি পেছনে তাকাব না।